জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

(পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র)

বুলেটিন নং ১২, ৩য় বর্ষ, ১০ই জুন, ১৯৯৩ ইং বৃহস্পতিবার

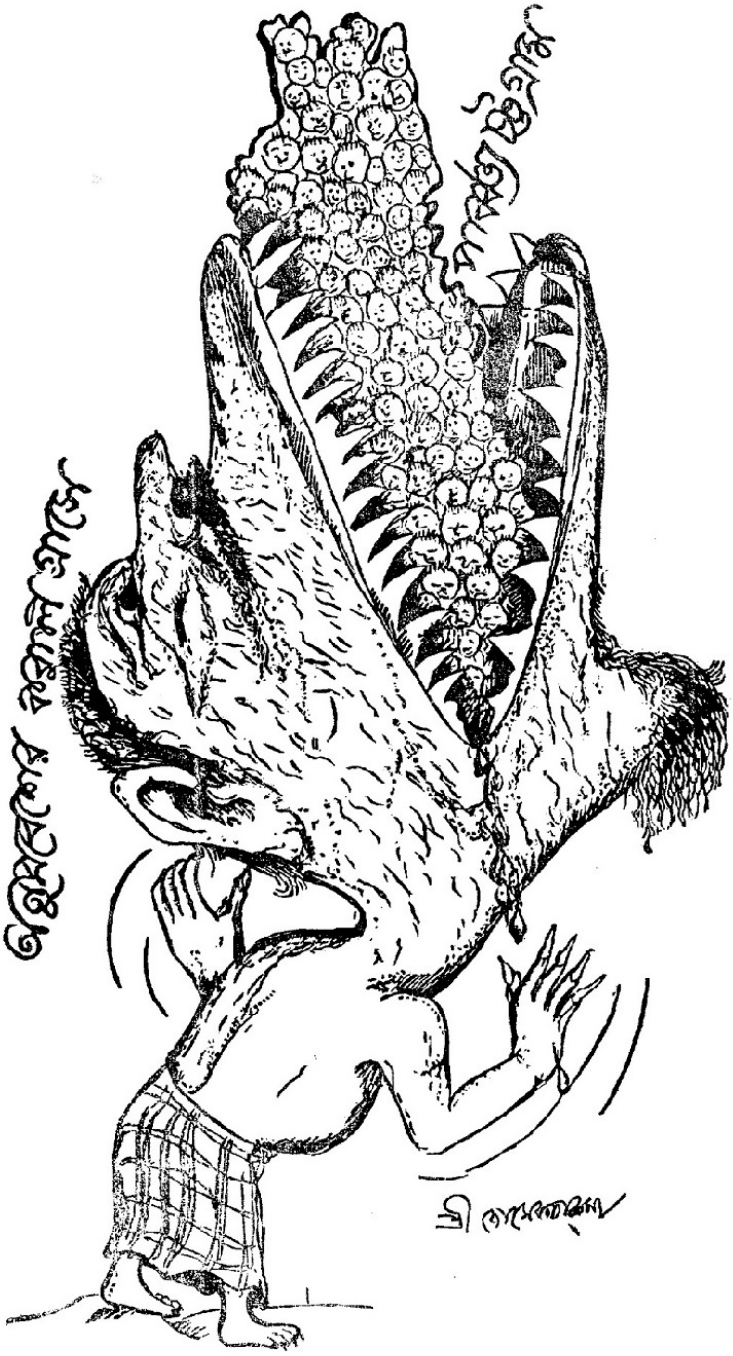

সম্পাদকীয়

বর্তমান বি, এন, পি, সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য এযাবত কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারী কমিটি গঠন করেছে ও জনসংহতি সমিতির সাথে ৩য় বারের মত আলোচনায় বসেছে। আর গত ৮ই জুন ত্রিপুরায় অবস্থানরত জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরত আনার উদ্যোগই সরকারের সর্বশেষ উদ্যোগ। কিন্তু জুম্ম শরণার্থীরা স্বদেশে ফিরে আসতে অস্বীকার করায় সরকারী এই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বলাবাহুল্য যে, সরকারের গৃহীত এসব উদ্যোগ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেনি। পর্যবেক্ষকমহলের ধারণা সরকারের আন্তরিকতা ও অসদিচ্ছাই এই পদক্ষেপ সমূহের ব্যর্থতার প্রধান কারন।

সরকারের গৃহীত প্রতিটি উদ্যোগে অআন্তরিকতা ও অসদিচ্ছার প্রমাণ মেলে যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদ এর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারী কমিটি গঠনে। যেহেতু কোন সদস্যের মতামত না নিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে এই কমিটি ঘোষণা করা হয় গত জুলাই, ৯২ এ। আর সেই কমিটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন সাংসদকে রাখা হয়নি। শেষ পর্যন্ত প্রবল জনমতের চাপে বাংলাদেশ সরকার খাগড়াছড়ি থেকে নির্বাচিত সাংসদ শ্রী কল্প রঞ্জন চাকমাকে এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়। এই কমিটি বিগত আট মাসে জনসংহতি সমিতির সাথে পর পর তিনটি বৈঠকে মিলিত হয়েছে। কিন্তু সরকারী দলের অসদিচ্ছা ও উদাসীনতার ফলে আলোচনার কোন অগ্রগতি হয়নি। ফলে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা ক্রমে ক্ষীণ ও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে এ যাবৎ এই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারী কমিটির সদস্যদের মধ্যে কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত করা হয়নি। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকারের কোন উন্নতি হয়নি। এ সরকারের বিগত দুই বৎসরের শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত হয়েছে মাল্যা গণহত্যা (ফেব্রুয়ারী/৯২), লোগাং গণহত্যা (এপ্রিল/৯২), গুমতি গণহত্যা/৯২, রাঙ্গামাটিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (মে/৯২), দিঘীনালা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসহ (অক্টোবর/৯২) জুম্ম জনগণের উপর নির্যাতন, নারী ধর্ষণ ও হত্যার অনেক ঘটনা। আর জুম্ম জনগণের প্রবল দাবী সত্ত্বেও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের বাতিল করা হয়নি এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও গুচ্ছগ্রাম, শান্তিগ্রাম, বড়গ্রাম সমূহ ভেঙ্গে দেয়া হয়নি।

গত ৮ই জুন স্থিরকৃত জুম্মশরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারের ব্যর্থতাও সরকারী অসদিচ্ছার ফলশ্রুতি। পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কোন উন্নয়ন না করে কেবলমাত্র নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন এবং ভূ-সম্পত্তি ফেরত দানের মৌখিক প্রতিশ্রুতি এই অসদিচ্ছার পরিচয় বহন করে। তাছাড়া শরণার্থীদের পেশকৃত ১৩ দফার পুরণ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত সরকারের সাথে চুক্তি—জুম্ম শরণার্থীদের প্রতি চরম উদাসীনতার বহিঃপ্রকাশ। তাই শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার সরকারী এই পদক্ষেপ ব্যর্থ হতে বাধ্য, হয়েছেও।

মূলতঃ জুম্ম শরণার্থী সমস্যাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার এক অবিচ্ছেদ্য দিক। জুম্ম জনগণের উপর সরকারী নির্যাতন, লুন্ঠন, হত্যা ও ভূমি বেদখল তথা উচ্ছেদনীতির ফলে এই জুম্ম শরণার্থীরা বিগত ৭ বৎসর ত্রিপুরাতে দুর্বিসহ জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জাতি সত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই জুম্ম শরণার্থীদের বিদেশের মাটিতে মানবেতর জীবন যাপনের কোন প্রশ্নই আসেনা। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু ও স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান হয়ে গেলে জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরতে কোন দ্বিধা বা সংশয় থাকবে না। বাংলাদেশ সরকার কেবলমাত্র আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার সাথে পার্বত চট্টগ্রাম সমস্যার একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান প্রদানের মাধ্যমে এই শরণার্থী সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে জুম্ম জনগনের ন্যায্য দাবী জনসংহতি সমিতির পেশকৃত ৫ দফা বাস্তবায়ন অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। এই ৫ দফার অন্যতম দাবী হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতলবাসী অনুপ্রবেশ রোধ ও বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে নেয়া। মূলতঃ এ দাবীর সাথে জুম্ম জনগনের অন্যান্য দাবীসমূহ—ভূমি অধিকার, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সাংবিধানিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি অধিকারসমূহ জড়িত। তাই বাংলাদেশ সরকারকে সর্বপ্রথমে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে, জুম্ম জনগনের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বহিরাগতদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা মেনে নিতে হবে।

জুম্ম জনগণ এখনও আশা করে যে, বাংলাদেশ সরকার সন্ত্রাসের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে, সামরিকভাবে নয় রাজনৈতিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ী সমাধানে পূর্ণ সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসবেন।

প্রসঙ্গ ঃ অনুপ্রবেশ বন্ধ ও বহিরাগতদের বহিষ্কার

শ্রীজগদীশ

পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের একমাত্র বৈপ্লবিক রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৫ দফার অন্যতম দাবী হচ্ছে—পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা ও বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া। বিগত ১৯৮৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিক বৈঠকে পেশকৃত ৫ দফা দাবীনামার ৩ নং দফায় ক (১) ও (২) অনুচ্ছেদে উক্ত দাবী সন্নিবেশিত হয়।

বলা বাহুল্য যে, জনসংহতি সমিতির এই দাবীটি বাংলাদেশ সরকারকে সবচেয়ে নাড়া দিয়েছে এবং সরকারের নিকট সবচেয়ে অগ্রহণযোগ্য দাবী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বর্তমানেও অনেক রাজনৈতিক বিজ্ঞমহল মনে করেন, বাংলাদেশ সরকার ৫ দফার অন্যান্য শর্তগুলি বিবেচনা করলেও এ দাবীটি বিবেচনা করতে নারাজ হবে। এটাই হবে সরকার ও জনসংহতি সমিতির ভবিষ্যত সমঝোতার প্রধান অন্তরায়। যেহেতু ৫ দফার প্রধান দাবী পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাদেশিক/আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবীকে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৯ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করে সীমিত আকারে পরোক্ষভাবে মেনে নিয়েছে। বর্তমান সরকারও স্বৈরাচারী এরশাদ প্রবর্তিত অগণতান্ত্রিক ও ষড়যন্ত্রমূলক এই জেলা পরিষদের তদবির বহাল রেখে স্বায়ত্ত শাসন প্রদানের সাফাই গেয়ে চলেছে। আর অন্যদিকে অনুপ্রবেশ বন্ধ ও বহিরাগতদের অন্যত্র সরানোর কথা দূরে থাক, আরো সূক্ষ্ম ও গোপনীয়ভাবে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চলেছে এবং পূর্ববর্তী সরকারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চলবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, অনেকে সমতলবাসী মুসলমানদের পার্বত্যাঞ্চলে অনুপ্রবেশ বন্ধ ও বসতীকারীদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার দাবীকে অবান্তর মনে করেন। এ দাবীকে অবান্তর ও অগ্রহণযোগ্য মনে করার পেছনে তাদের যুক্তি হচ্ছে—

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী সমতল-বাসী মুসলমানদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ও বসবাসের অধিকার আছে ;

খ) বাংলাদেশ হচ্ছে একটি জনসংখ্যা বহুল দেশ। তাই জনবিজ্ঞান মতে জনসংখ্যা বিরল পার্বত্যাঞ্চলে অভিবাসন ঘটবে ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হবে ;

গ) পার্বত্যাঞ্চলের খাস জমিতে সমতলবাসী মুসলমানদের পুনর্বাসন করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। তাই অনেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৩০ লক্ষ লোকের সংস্থানের প্রস্তাব করেছেন। (পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে কিছু ভাবনা—১ ফেরদৌস আহম্মদ কোরেশী, রোববার) ;

ঘ) পার্বত্যাঞ্চলের জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে যোগাযোগ, শিল্প, বাণিজ্যের প্রসার ও প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ সম্ভব হবে ;

ঙ) মুসলমান বাঙালীদের সংস্পর্শে জুম্ম জনগণের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধিত হবে ;

চ) মুসলমান বাঙালীরা যুগ যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে আসছে। অনেক ভাষ্যকারের মতে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী এবং জুম্ম জনগণ ১৭০০ সালে অভিবাসন করেছেন।

উপরোক্ত যুক্তিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশহেতু সমতলবাসীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ও বসবাসের সাংবিধানিক অধিকার থাকলেও কিন্তু ক্ষুদ্র, অনুন্নত ও দরিদ্র দুর্বল জুম্ম জনগোষ্ঠীর উচ্ছেদ করে তাদের বসতভিটায় বসতি স্থাপনে ও ভূমি বেদখল করার কোন সাংবিধানিক অধিকার সমতলবাসীদের নেই। এটা বরং সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও শক্তির বদৌলতে সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারসহ সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার হরণের নামান্তর। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো পৃথক শাসন ব্যবস্থা (১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি) চালু রয়েছে। আর জনসংখ্যা বিরল পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসন করে এলাকার উন্নতির বিষয়টিও অত্যন্ত অবাস্তব। যেহেতু যেখানে জুম্ম জনগণের মাথাপিছু

চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২৮ শতাংশ, যেখানে ৫০% ভাগ জুম্ম কৃষক সম্পূর্ণ ভূমিহীন এবং জুম, বাগান কৃষি ও বনজ সম্পদ

জুম্ম ভূমি বেদখল করে নেয়। জুম্মরা নিজ বাস্তুভিটা ও ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে বনে-জংগলে আশ্রয় নিতে বাধ্য

পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন (নদী ও সংরক্ষিত বনসহ)=৫০৮৯ বর্গমাইল (৩২,৫৬,৯১০ একর)
ভূমির পরিমাণ (নদী ও সংরক্ষিত বনভূমি বাদে)=১,৪২৩ বর্গমাইল (৯,১০,৭২০ একর)
চাষযোগ্য জমির পরিমাণ=২,০৭,৫৩৫ একর
মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ=২৮ ডেসিমেল।

আহরণের উপর নির্ভরশীল সেখানে সমতলবাসীদের অভিবাসন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্পূর্ণ অবাস্তব।

উপরোক্ত বাস্তবর্বজিত যৌক্তিকতার আলোকে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮—১৯৮৪ সালের মধ্যে তিন পর্যায়ে ৪ লক্ষ বহিরাগত মুসলমান বাঙালীকে পার্বত্যাঞ্চলে পুনর্বাসন করে। তাই এ অবাস্তব পুনর্বাসন পরিকল্পনার ফলে একদিকে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে অন্যদিকে বহিরাগত মুসলমানেরা হয়েছে সম্পূর্ণ প্রতারিত ও গভীর ষড়যন্ত্রে নিক্ষিপ্ত। সরকারী পুনর্বাসন পরিকল্পনার গোপন দলিল হ'তে জানা যায় যে, প্রতিটি পরিবারকে ৫ একর পাহাড়, আড়াই একর ধান্য জমি, ২ একর উঁচু জমি, এক জোড়া বলদ, প্রয়োজনীয় সার, বীজ, ছয় মাসের খোরাকী ও একবালীন ৩৬০/- ১৫০০/- টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদেরকে পর্বত্যাঞ্চলে আসতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এই প্রতিশ্রুত কোন জমি তাদেরকে প্রদান করতে পারেনি। ফলে তাদেরকে জুম্মদের গ্রাম ও জমির আশেপাশে অনুচ্চ পাহাড়ে বসতি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় প্রশাসন ও সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় এই বহিরাগতরা জুম্মদের বাগ-বাগিচা ও জমি বেদখল করতে থাকে। বহিরাগতদের জোর পূর্বক ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে জুম্ম জনগণ স্থানীয় বেসামরিক ও সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট কোন সুবিচার পায়নি। ফলে জুম্ম ও বহিরাগতদের মধ্যে ভূমি নিয়ে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। বলা বাহুল্য এসব সংঘর্ষে জুম্মরা ছিল খুবই অসহায়। এই সংঘর্ষে বহু জুম্মকে নিজ জন্মভিতে প্রাণ দিতে হয়। সামান্য সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে বহিরাগতরা সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় জুম্ম গ্রাম হামলা চালিয়ে হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করে জুম্মদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদ ও সমস্ত হয়। এভাবে তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবু মুহাম্মদের ভাষায় — আসলে ঐ ৪ লক্ষ বাঙালী মুসলমান হচ্ছেন সমগ্র দমন পীড়নের একটি হাতিয়ার মাত্র, দরিদ্র আর অসহায়ত্বের সুযোগে যাদেরকে চরম অসহায় আরেকটি অবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী যেভাবে বিহারীদেরকে এখানে মুসলমান বাঙালী জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল সেই বিহারীদের সঙ্গে এই মুসলমান বাঙালীদের অনুরূপ তুলনা টানা চলে। (দিক চিহ্ন, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২৯ আগষ্ট/৯১)

পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমান বাঙালীদের পুনর্বাসন কিন্তু পাকিস্তান আমলে শুরু হয়েছিল। ৫০ এর দশকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার বহু মুসলমান বাঙালীকে লংগদু, নানিয়াচর ও রামগড়ের বিভিন্ন এলাকায় এবং বান্দরবানে পুনর্বাসিত করে। ৭০ দশকে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ শতগুণ বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি '৭৮ — '৮৪ সালের মধ্যে উল্লেখিত বহিরাগতদেরকে পার্বত্যাঞ্চলের মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়ি, মহালছড়ি, কাউখালী, নানিয়াচর, বরকল, লংগদু, দিঘীনালাসহ বান্দরবানের ৮০% ভাগ ভূমি বেদখল করে পুনর্বাসন দেয়া হয়। বর্তমানে বহিরাগতদের সংখ্যা ৫০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং পার্বত্যাঞ্চলের ৬০% ধান্য জমি তাদের বেদখলে নিয়ে গেছে। আর আনুমানিক ১০% ভাগ জমি সরকার বিভিন্ন প্রকল্প, অফিস ও গৃহাদি নির্মাণ, সেনা ছাউনি স্থাপনের মাধ্যমে অধিগ্রহণ ও বেদখল করে নিয়েছে। তাই দেখা যায় যে, পার্বত্যাঞ্চলের ৭০% ভাগ জমি আজ জুম্মদের বেহাত হয়ে গেছে। বলা যায় জুম্ম জনগণ ভূমিহীন জাতিতে পরিণত হতে চলেছে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় জুম্মদের

অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

পার্বত্যাঞ্চলের বহিরাগতদের পুনর্বাসনের এই বাস্তবতার আলোকে এই পুনর্বাসিত বহিরাগতদের পার্বত্যাঞ্চল থেকে বহিস্কার করে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার দাবী দিন দিন জোরালো হয়ে উঠছে। জুম্ম জনগণের এই দাবীর পক্ষে যৌক্তিকতা কতটুকু তা বিশ্লেষণ করা যাক।

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও বৃটিশ আমল হ'তে ঐ অঞ্চল পৃথক আইনের শাসনাধীন ছিল। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন ও পরবর্তীতে পাকিস্তান শাসনামলে এই পৃথক শাসন ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জুম্ম জনগণের প্রতিনিধিগণ পার্বত্যাঞ্চলের এই পৃথক শাসনের আলোকে স্ব-শাসন দাবী উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণের এই দাবীকে অস্বীকার করে তাদের পৃথক সত্তাকে কোন স্বীকৃতি না দিয়ে শাসনতন্ত্র রচনা করেছিল।

খ) পার্বত্যাঞ্চল জনবিরল এলাকা হলেও এখানে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই কম। মাথাপিছু ২৮ শতাংশ মাত্র। এখানকার ৮৫% ভাগ জমি পাহাড়ী অঞ্চল, বন্ধুর, অনুর্বর ও বনাঞ্চলে ঢাকা। এগুলো বসবাসের অযোগ্য। তাই এখানে বহিরাগতদের পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা অবাস্তব ও অবাস্তব।

গ) জুম্ম বিদ্বেষী ও বৈষম্যমূলক সরকারী নীতিতে মুসলমান বাঙালীদের পাশাপাশি অশিক্ষিত, সহজ সরল জুম্মদের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই জুম্মদের অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা বজায় রাখতে সংরক্ষণের প্রয়োজন।

ঘ) বৃহত্তর ও আগ্রাসী ঐসলামিক সংস্কৃতির কাছে জুম্ম সংস্কৃতি বিলীন হতে বাধ্য। তাই বহিরাগতদের পুনর্বাসন জুম্ম সংস্কৃতি ধ্বংসের নামান্তর।

ঙ) এখানে বহিরাগতদের অবাস্তবভাবে পুনর্বাসনের ফলে জুম্মদের জমি, বাগ-বাগিচা বেদখল হচ্ছে ও জুম্মদের ভূমি অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

চ) বহিরাগতরা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতায় ভূমি বেদখল, হত্যা, নারী ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করে জুম্ম উচ্ছেদ অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

ছ) এখানে মুসলমান বাঙালীদের পুনর্বাসনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্যাঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা।

জ) জুম্ম জনগণই এখানকার প্রকৃত আদিবাসী। তাই পার্বত্যাঞ্চল জুম্মদের আবাসস্থল। এখানে বহিরাগতদের পুনর্বাসন জুম্মদের উচ্ছেদের নামান্তর।

উপরোক্ত যুক্তিসমূহের আলোকে এটা স্পষ্ট যে অর্থনৈতিক উন্নতি ও জনসংখ্যার ঘনত্বের ভারসাম্য রক্ষার্থে পার্বত্যাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ বহিরাগত মুসলমান বাঙালীর পুনর্বাসন সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অবাস্তব পরিকল্পনা। এটা জুম্ম জনগণের উচ্ছেদের হীন ষড়যন্ত্র ও উগ্র ধর্মান্ধ ঐসলামিক সাম্প্রদায়িক বহিঃপ্রকাশ। বিগত সময়ের সামরিক অফিসার/জেনারেলদের নিম্নোক্ত উক্তিগুলিতে জুম্মদের উচ্ছেদ ও অবলুপ্ত করার হীন উদ্দেশ্য আরো পরিস্ফুট হয়ে উঠে। ১৯৭৪ সালে দিঘীনালা ক্যান্টনমেন্টের লেঃ কবির একদিন দিঘীনালা হাই স্কুলের ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন— No autonomy, no tribals, if necessary, sperms of five lakh Bengalees would be in your wombs and you give birth to Bengalee children. ১৯৭৭ এ খাগড়াছড়িতে এক জনসভায় তৎকালীন জি ও সি, চট্টগ্রাম মেজর জেনারেল মঞ্জুর বলেন—যাদেরকে এই জেলায় পুনর্বাসিত করা হচ্ছে, তারা গরীব ও ভূমিহীন। এই এলাকায় জনসাধারণকে তাদের আশ্রয় দিতে হবে। এর অন্যথায় তিনি জুম্মদের হুমকি দিয়ে বলেন, আমরা তোমাদের চাইনা। তোমরা যেখানে খুশী চলে যেতে পার। আমরা চাই তোমাদের মাটি। তিনি ১৯৮০ সালে খাগড়াছড়িতে অন্য এক জনসভায় আরো বলেন— We want the land and not the people of Chittagong Hill Tracts. ১৯৮০তে ক্যাঃ বায়োজিদ বলেন—There is no room for Kafirs (nonbeliever of Islam). The people of Chittagong Hill Tracts are Kafirs. So, it is our sacred duty to Islamise Chittagong Hill Tracts and INSHA- ALLHA (by the grace of GOD) we will be successful. এযাবত আরো কত সেনা কর্মকর্তা বিভিন্ন জনসভায় এভাবে আরো কত মন্তব্য করেছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। বলা বাহুল্য পার্বত্যাঞ্চলে নিয়োজিত

সেনা কর্মকর্তারা একই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই জুম্ম উচ্ছেদ ও ইসলামিক সম্প্রসারণের সকল প্রকার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

পার্বত্যাঞ্চলের বর্তমান বিরাজমান পরিস্থিতি ও ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দুটো দিক স্পষ্ট হয়ে উঠে। (এক) জুম্মদের উচ্ছেদ ও ইসলামিক সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ সরকার বদ্ধ পরিকর। এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার জুম্মদের দমন, উৎপীড়ন, উচ্ছেদ ও নির্মূল করার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে। সেই বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ও জুম্মদের ভূমিতে মুসলমানদের পুনর্বাসন করে ইসলামিক সম্প্রসারণের সকল পরিকল্পনা কার্যকরী করে চলেছে। অপরদিকে (দুই) জনসংহতি সমিতি জুম্মদের অস্তিত্ব রাক্ষার্থে স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আপামর জুম্ম জনগণ, ছাত্র-শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা আজ এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ৫ দফা বাস্তবায়নের দাবীকে জোরদার করেছে। বাংলাদেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সংগঠন এবং বুদ্ধিজীবীরা আজ জুম্মদের এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এহেন বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ বন্ধ ও পুনর্বাসিতদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়াসহ ৫ দফার বাস্তবায়ন ব্যতীত এই সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান সুদূর পরাহত। এক্ষেত্রে জুম্ম জনগণের ন্যায্য দাবীকে মেনে নিয়ে বাংলাদেশ সরকারকে সর্বপ্রথমে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে ও পুনর্বাসিতদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে।

নিবন্ধ

সরকারের অসদিচ্ছাই—জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরে আসার অন্তরায়

শ্রীসত্যজিৎ

শেষ পর্যন্ত জুম্ম শরণার্থীরা দেশে ফিরতে অস্বীকার করেছে। সেই সাথে তাদের প্রত্যাবর্তনে সরকারের ঢাকঢোল ও সকল অনাড়ম্বর অপচেষ্টারও অবসান ঘটেছে। স্বদেশে ফিরে আসতে তাদের এ অস্বীকৃতি যেন বিদেশের মাটিতে দুর্বিসহ জীবনের আরো সহিষ্ণুতা ও আরো অভিজ্ঞতা অর্জনের অভিব্যক্তি। কিন্তু দেশে ফিরতে তাদের এ অনীহা কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেয়া যায়—অসদিচ্ছা। বাংলাদেশ সরকারের এ অসদিচ্ছার ফলে অর্ধ লক্ষাধিক জুম্ম শরণার্থীকে বিদেশের মাটিতে আরো অনিশ্চিত প্রবাসী জীবন কাটাতে হবে। ভারত সরকারের বইতে হবে এ সব হতভাগ্য জুম্ম নর-নারীদের ডাল-ভাতের খরচ। আর বাংলাদেশ সরকারের কি হবে? সেই উত্তর প্রতিনিধিদলের প্রধান কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদের ভাষায়—শরণার্থীরা দেশে ফিরলে বাংলাদেশ সরকারের কোন লাভ নেই, ফিরে না গেলেও কোন ক্ষতি নেই। এর চেয়ে অসদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ কি হতে পারে!

শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের এ অসদিচ্ছা প্রথম থেকেই ছিল। ইতিপূর্বে গুইমারা-মাটিরাঙ্গা-বেলছড়ি হত্যাকাণ্ডের ফলে ১৯৮১ সালে ১৭০০০ জুম্ম ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। ছয় মাস পর তাদেরকে স্বদেশে ফেরত আনা হয়। এসব শরণার্থীদেরকে নিজ বাস্তুভিটায় পুনর্বাসন ও জায়গাজমি ফেরত দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাদেরকে কোন বাস্তুভিটা ও জমি ফেরত দেয়া হয়নি, অন্য কোন খানে পুনর্বাসিতও করা হয়নি। অনুরূপ খাগড়াছড়ি-মাটিরাঙ্গা-পানছড়ি হত্যাকাণ্ডের ফলে বর্তমান শরণার্থীরা ১৯৮৬ সালে ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তী বৎসর ১৯৮৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী তাদেরকে ফিরিয়ে আনার সর্বপ্রথম উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু শরণার্থীদের প্রকৃত সমস্যার সমাধানের কোন সদিচ্ছা বাংলাদেশ সরকারের ছিল না। কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক জনমতের চাপে তৎকালীন সরকার শরণার্থীদরকে ফেরত নিতে চেয়েছিল। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামে তখন চলছিল বিদ্রোহ দমনের নামে ব্যাপক নির্যাতন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও হত্যা। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে শরণার্থীরা স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসতে অস্বীকার

করে। এরপর শরণার্থীদের বুঝিয়ে স্বদেশে ফিরতে রাজী করানোর জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা বার বার ত্রিপুরা সফর করেন। কিন্তু প্রতিবারই তাদের এসব সফর ব্যর্থ হয়। এসব সরকারী প্রতিনিধিরা শরণার্থীদের কোন দাবীনামা গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। শুধুমাত্র মিথ্যা প্রলোভনে তাদেরকে রাজী করাতে চেষ্টা চালায়। এবারেও বাংলাদেশ সরকার যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদদের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল পাঠায় শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের জন্য ভারত সরকারের সাথে আলাপ করতে। তাই জনাব অলি আহম্মদ প্রথমে যান পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শরণার্থীদের ফিরিয়ে দিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে দেয়ার জন্য। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকটও অনুনয় করেন শরণার্থীদের ফিরিয়ে দিতে। পরিশেষে তিনি পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর সাথে চুক্তিও করলেন। এ চুক্তি অনুযায়ী ৮ই জুন থেকে শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার সবরকম পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ভারত সরকারও সর্বরকম সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শরনার্থীরা দেশে ফিরে আসতে অস্বীকার করে। অথচ জুম্ম শরণার্থীরা নিজ দেশের নিজ বাস্তুভিটায় ফিরে আসতে সব সময় উন্মুখ। তারা কোন দিন স্বদেশে ফিরে আসতে বিন্দুমাত্র অনীহা দেখায়নি। তাই ইতিমধ্যে কয়েক হাজার শরণার্থী স্বদেশে ফিরে এসেছেও। কিন্তু স্বদেশে ফিরে তারা কি পেয়েছে? পেয়েছে শান্তিগ্রাম-বড়গ্রাম-গুচ্ছগ্রামের বন্দীদশা ও অভিশপ্ত জীবন। তারা প্রত্যক্ষ করেছে তাদের বাস্তুভিটার অবাঞ্ছিত-দের অবাধ পদচারণ, হায়েনাবাহিনীর রক্তচক্ষু আর কারণে অকারণে লাঞ্ছনা। এসব অভিজ্ঞতা ও লোগাং গণ-হত্যার আতংক নিয়ে আবার অনেকে ফিরে গেছে ত্রিপুরার সেই শিবিরে। এবারেও স্বদেশ ফিরে আসতে ব্যর্থ হয়ে তাদের জীবন আরো অনিশ্চয়তায় ঘণীভূত হলো।

বস্তুতঃ জনাব অলি আহম্মদ এবারে চেয়েছিলেন শরণার্থী-দেরকে শূন্য মাঠে গোল করে ১৯৮১ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে। তিনি বলেন—পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে এসেছে। দেশে ফিরে আসুন, জমিজমা ফেরত দেয়া হবে, নিজ বাস্তু-ভিটায় যেতে দেয়া হবে, নিরাপত্তা দেয়া হবে ইত্যাদি। তিনি এমন ভাব দেখালেন—

আসলাম—দেখলাম—জয় করলাম
ভারতের সাথে চুক্তি, পেনাল্টি কিক্
হাসলেন—বললেন
ম্যাডাম সবই ঠিক।

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি ফিরে এসেছে কিনা শরণার্থীদের তা জানার অবকাশ নেই। তারা জানে তাদের বাস্তু-ভিটা কাদের দখলে, আর তাদের জমিতে কাদের লাঙ্গল চলে। তার এই মিথ্যা প্রলোভনে শরণার্থীরা হতাশ হয়েছে। তাদের ১৩ দফাকে সরকার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছে। অথচ বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বার্মায় ফেরত পাঠাতে যেমন উদ্গ্রীব, তেমনি তাদের দাবীদাওয়া নিয়ে সোচ্চার। প্রথম থেকে রোহিঙ্গা সমস্যাকে আন্তর্জাতিক ফোরামে উপস্থাপিত করেছে। রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি নিয়ে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনের তত্ত্বাবধানে স্বদেশ পাঠাতে দাবী জানিয়ে আসছে। কিন্তু নিজ দেশের শরণার্থীদের জীবনের নিরাপত্তা দিতে বাংলাদেশ সরকারের এত ব্যর্থতা কেন?

তাই আজ প্রশ্ন জাগে আরো কত প্রলোভন ও কত প্রবঞ্চনা দেখাবে বাংলাদেশ সরকার? কবে অবসান হবে শরণার্থীদের দুর্বিসহ প্রবাসী জীবন? এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে আন্তরিকভাবে। জুম্ম শরণার্থীদের ১৩ দফাকে বিবেচনা করতে হবে। অন্যথায় সরকার অসদিচ্ছারই পুনরাবৃত্তি ঘটাবে।

অভিমত

পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ সমাধান না কালক্ষেপণের কৌশল

কল্পরঞ্জন চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি অবহেলিত এবং পশ্চাদপদ অঞ্চল। এর আয়তন ৫০৯৩ বর্গমাইল। বর্তমানে অঞ্চলটি রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান এই তিন জেলায় বিভক্ত। এর ভৌগোলিক অবস্থানও তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে এই বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে নানা কারণে জাতীয় পর্যায়ে এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এক বিরাট ধূমজাল সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। সবার মনে এই প্রশ্ন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সত্যিকার অর্থে কি চলছে? কি-ই বা হচ্ছিল এদ্দিন কিংবা কি-ই বা হতে যাচ্ছে আগামীতে? এখানে যারা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে সেই অধিবাসীরাই বা কারা? তাদের বর্তমান অবস্থানই বা কোন পর্যায়ে রয়েছে?

পাহাড় পর্বত নদীনালা পরিবেষ্টিত এই পার্বত্য চট্টগ্রামে মূলত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও তঞ্চংগ্যাসহ অন্যান্য আরও দশ ভাষাভাষি তেরটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু জাতিসত্তার উপজাতি জনগণের বসবাস। অবশ্য ১৮৮০ সাল থেকে কিছু সংখ্যক বাঙালী মুসলমানও এই পার্বত্য অঞ্চলে আগমন করে। বর্তমানে তাদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। এই পার্বত্য অঞ্চলে চাকমা সম্প্রদায়ের লোকেরাই সবচেয়ে বেশি। তারপরে মারমা, ত্রিপুরা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা। এদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলী লোকেরাই বেশী। এরপর রয়েছে হিন্দু খৃষ্টান ও প্রকৃতি পূজারী সম্প্রদায়ভুক্ত উপজাতীয় জনগণ। এই সব ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটিই ঐতিহ্যগতভাবে নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অধিকারী। এদের ভাষাও আলাদা আলাদা। এই পার্বত্য চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ ভারত সরকার ১৯০০ সালে নন্‌রেগুলেটেড জেলার মর্যাদা দিয়ে এক্সক্লুডেড এরিয়া হিসেবে চিহ্নিত করে এবং পরে পাকিস্তানী শাসনামলে ১৯৬২ সালে ট্রাইবল এরিয়া নামে আখ্যায়িত করা হয়। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান শাসনামলে যদিও এই অঞ্চলকে নানা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল তথাপিও এ সময়ে এখানকার জনগণ পরম সুখ ও শান্তিতে বসবাস করেছিল বলে তারা মনে করে। বিশেষ করে তাদের সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং ঐতিহ্য সব সময় তৎকালীন সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আলাদা একটি শাসনবিধি ছিল যা চিটাগাং হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল অব নাইনটিন হানড্রেড এ্যাক্ট নামে পরিচিত। এই শাসনবিধির বিভিন্ন ধারাবলে সংরক্ষিত ছিল উপজাতি জনগণের ভূমির অধিকার, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সভ্যতা যা কোন সময়েই অন্য কেউ মলিন করতে পারেনি। তাই এই শাসনবিধির আওতায় নির্দ্বিধায় বলা চলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগণ তখন স্বায়ত্তশাসনই ভোগ করত। যদিও ইদানীং কোন কোন শিক্ষিত মহল কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ শাসনবিধি উপজাতীয় জনগণের জন্য পর্যপ্ত ছিল না বলে মনে করেন এবং কিছু বিধির পরিবর্তন কামনা করেন। এতে অনেকের পুরোপুরি মত না থাকলেও দ্বিমত পোষণ করেন খুব কম উপজাতি জনগণ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন বাংলাদেশের মোট আয়তনের দশ ভাগের এক ভাগ। সরকারী পরিসংখ্যানে দেখানো হয় যে, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের চাইতে এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা খুব কম। মাত্র সাত লক্ষ লোক এখানে বাস করে। কিন্তু এই পার্বত্য চট্টগ্রামেরই ভৌগোলিক কাঠামো অনুসারে ভূমি বন্টনের সঠিক চিত্র যদি তুলে ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা কোন অংশেই কম নয়। বরং বলতে হয় এই অঞ্চলই সবচেয়ে বেশি ঘন লোক বসতিপূর্ণ এলাকা। কেননা সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের রিজার্ভ ফরেস্টের দখলে আছে ৬১৭.০০ বর্গমাইল, পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের রিজার্ভ ফরেস্টের দখলে আছে ৩১৫.০০ বর্গমাইল সাংগু রিজার্ভ ফরেস্টের দখলে আছে ১২৮.২৫ বর্গমাইল, মাতামুহুরী রিজার্ভ ফরেস্টের দখলে আছে ১৬০.৭১ বর্গমাইল, অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল রয়েছে ৩১৬৬.০০ বর্গমাইল কাপ্তাই হ্রদ এলাকা রয়েছে ৩৫০.০০ বর্গমাইল, সর্বমোট ৪৭৩৬.৯৬ বর্গমাইল।

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন ৫০৯৩ বর্গমাইল সেহেতু সরকার কর্তৃক দখল করা জমির পরিমাণ ৪,৭৩৬,৯৬

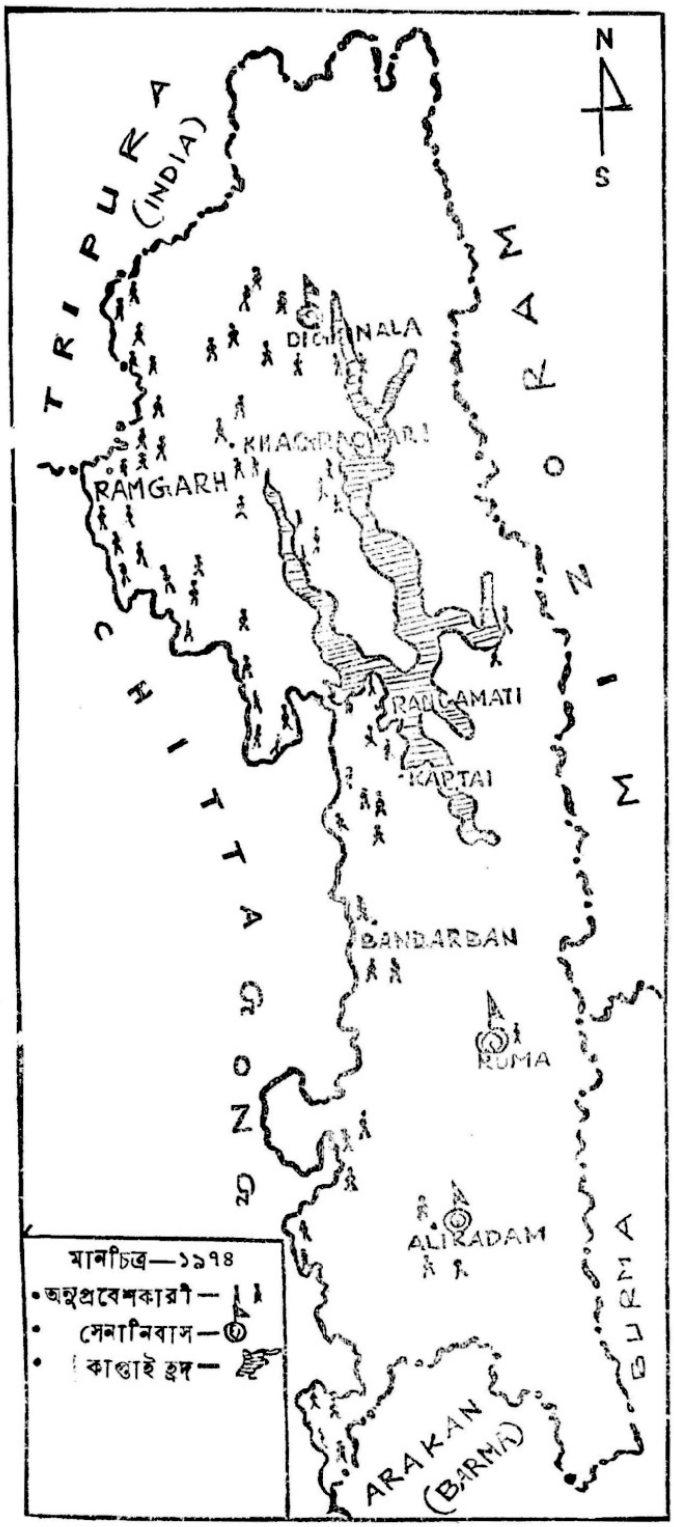

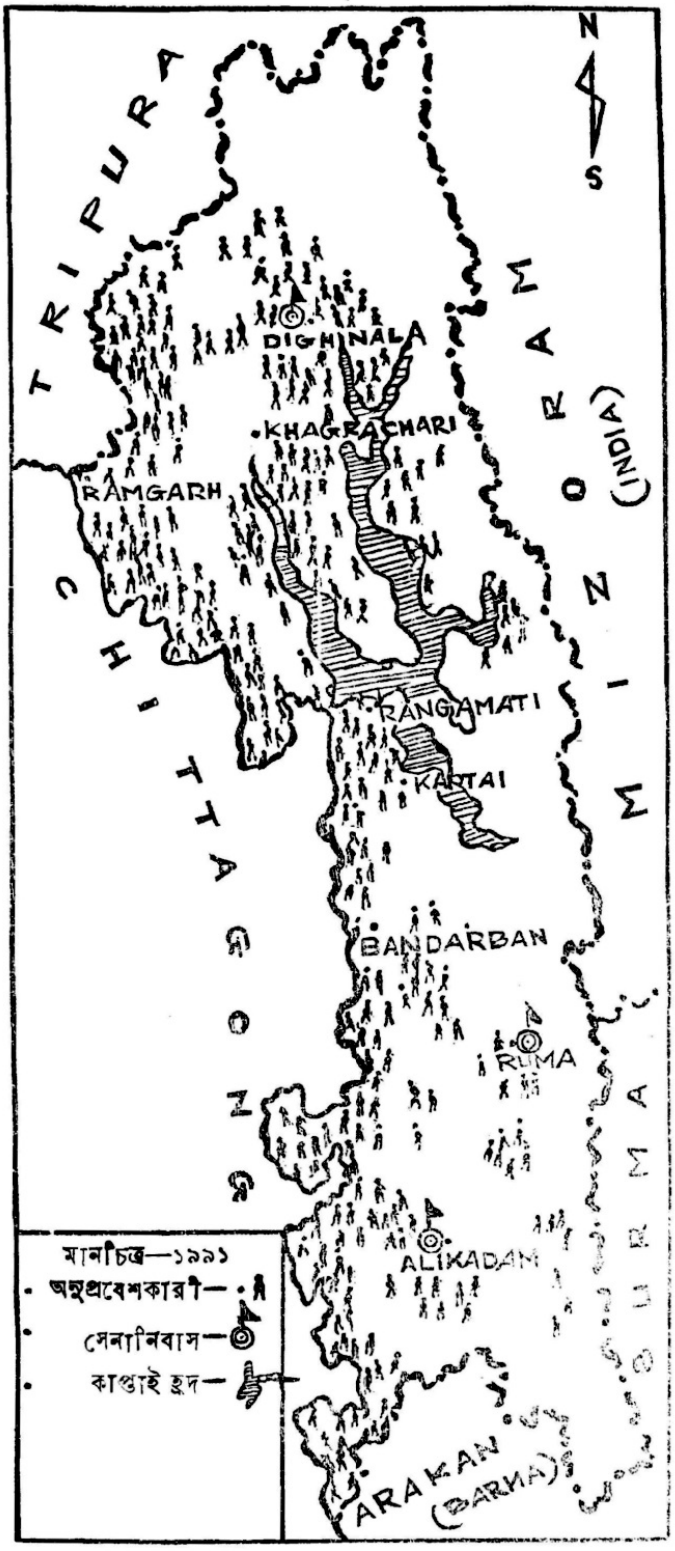

N
S
TRIPURA
(INDIA)
MIZORAM
CHITTAGONG
DIGHINALA
KHAGRACHARI
RAMGARH
RANGAMATI
KAPTAI
BANDARBAN
RUMA
ALIKADAM
ARAKAN
(BARMA)
BURMA
মানচিত্র—১৯৭৪
অনুপ্রবেশকারী—
সেনানিবাস—
কাপ্তাই হ্রদ—

N
S
TRIPURA
MIZORAM
(INDIA)
CHITTAGONG
DIGHINALA
KHAGRACHARI
RAMGARH
RANGAMATI
KAPTAI
BANDARBAN
RUMA
ALIKADAM
ARAKAN
(BARMA)
BURMA
মানচিত্র—১৯৯১
অনুপ্রবেশকারী—
সেনানিবাস—
কাপ্তাই হ্রদ—

Secret Memorandum

SECRET

Commissioner
Chittagong Division

Memo No. 665-C
To : Mr.

It has been decided that landless/rivar erosion affected people from your district will be settled in Chittagong Hill Tracts (CHTs). The settlement will be done in selected Zones and each family will be given Khas land free of cost according to the following scale :—

Plain land	$2\frac{1}{2}$ acres.
Plain and dumpy mixed	4 acres
Hilly land	5 acres

It has been decided that you will send 5,000 families.

You are requested to collect particulars of intending and suitable families from the Chairman of the concerned Union Parishads sought them out and furnish list to the Deputy Commissioner, CHTs through special messenger by the 30th of Sept./80 at the latest. To keep paper record of the selected settlers, group leaders and issue of Identity card in all the districts in an uniform manner, detail guidelines have been prepared (copy enclosed) so that you can ensure strict compliance of the concerned Union Parishad Chairman.

It is the desire of the Govt. that the concerned Deputy Commissioner will give top priority to this work and make the programme a success. You are requested to immediately call a meetting of the concerned Chairman, Union Parishad and give them detailed instructions in the matter.

I would like to have a report about the action taken by you in the matter by 15. 9. 80 positively for information of the Govt.

Sd/ Saifuddin Ahamed,
5-9-80
Commissioner
Chittagong Division

বর্গমাইল যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে অবশিষ্ট থাকে শুধুমাত্র (৫০৯৩-৪৭৩৬.৯৬) ৩৫৬ বর্গমাইল। যার মোট পরিমাণ একর হিসেবে ২,২৯,৭৮৬ একর। এরমধ্যে আবার হাট-বাজার, সরকারী অফিস, স্কুল-কলেজ ইত্যাদির জন্যে আনুমানিক ১০০ বর্গমাইল (৬৬,৪৬৭.০০ একর) জমি দখলে আছে। কাজেই মোট চাষযোগ্য জমি বাকি থাকে মাত্র ১,৬৫,৭৮৬'০০ একর।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি অধিবাসীদের লোকসংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ। তারপরও রাজনৈতিক কারণ দর্শিয়ে এবং বিভিন্ন অজুহাতে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ সমতলবাসীকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় পলিটিক্যাল ইমিগ্রান্ট হিসেবে নিয়ে আসা হয়। যার ফলে এই অশান্ত অঞ্চলটির পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে। আমরা যদি হিসেব করে দেখি, শুধুমাত্র আদিবাসী সাত লিক্ষ লোকের জন্য বস্তুতপক্ষে জায়গা আছে মাথাপিছু মাত্র ০.২৪ শতাংশ। কাজেই এই অবস্থা যদি সমতলবাসী (পলিটিক্যাল সেটেলার) পাঁচ লক্ষ লোককে এই জমির ভাগাভাগি আওতায় আনা যায় তাহলে প্রতিটি লোকের জন্য থাকে মাত্র ০.১৩ শতাংশ জমি। এই পাঁচ লক্ষ পলিটিক্যাল সেটেলারদের সাথে এই অঞ্চলের আদিবাসীদের সরাসরি কোন বিবাদ বা দ্বন্দ্ব না থাকলেও সরকারের নিকট আমাদের প্রশ্ন, এমন অপরিণামদর্শী এবং বিবেকবর্জিত পন্থায় কেন এসব লোকদের আনা হলো? তাহলে কি আমাদের ধরে নিতে হবে যে সরকারের এসব করার পেছনে নিশ্চয়ই কোন একটা উদ্দেশ্য আছে এবং তা হলো এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জাতি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন বা উচ্ছেদ করা? আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ চেয়েছিলাম সফল স্বাধীনতা সংগ্রামের পর অর্থাৎ এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে বাঙালী জাতির উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় মিশে আমাদের স্বকীয় কৃষ্টি, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য নিয়ে সুখ-শান্তিতে বসবাস করবো। এক কথায় বলতে গেলে আমরা চেয়েছিলাম দেশের এবং জাতির সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে থাকতে। জাতিও গৌরব বোধ করতে পারত এবং সারা বিশ্বও বলত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক মিলনক্ষেত্র।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে হবে। উল্লেখ্য, এই সমস্যার সমাধান দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন দলের সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে একটি সরকারী কমিটি গঠন করেছে। যদিও এই কমিটির একটি জবাবদিহিমূলক সংসদীয় কমিটি হওয়া উচিত ছিল, তবু ঐ সরকারী কমিটি গঠিত হওয়ার পর সমস্ত জাতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল এবং আশা করেছিল যে এবার হয়ত বর্তমান সরকার সত্যিকারভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান দেবে। এর সাথে সাথে ফিরে আসবে অনাবিল শান্তি আর জাতিকে আরও উন্নয়নের এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই কমিটির প্রতি সরকারের নির্দেশ ছিল অনধিক তিন মাসের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৯২ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্যা সমাধানের মূল বিষয়গুলি চিহ্নিত করে সুপারিশসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করার। কেননা বর্তমানে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত ৫০ হাজার পাহাড়ী শরণার্থীদের ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯২-এর পরে ভারত সরকার আর কোন রেশন যোগান দেবে না বলে বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিশেষ প্রতিবেদন আকারে খবর ছাপা হয়েছিল। ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে উল্লিখিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি দুইবার বৈঠক করেছে। বৈঠকে সমস্যা সমাধানে কতদূর অগ্রগতি হয়েছে, এ ব্যাপারে জাতি অধীর আগ্রহে জানতে চেয়েছিল। অথচ এ ব্যাপারে জাতিকে আজ পর্যন্ত কোন কিছুই জানতে দেয়া হয়নি। চলতি বছরের গত ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে আরও একবার বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও অজ্ঞাত কারণে তা অনুষ্ঠিত হয়নি। এছাড়া '৯৩-এর মার্চের ১২ তারিখে এই কমিটির ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়ে প্রতিটি শরণার্থীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার অনুরোধ জানানোর কথা ছিল। কিন্তু পরে তাও বাতিল করা হয়েছে।

সরকার বার বার বলেছে যে, শরণার্থীরা ফিরে এলে তাদের যথাযোগ্য মর্যাদায় পুনর্বাসিত করবে। এমনকি তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমিও ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করবে। অথচ এই ঘোষণার আগে বা পরে যে সমস্ত শরণার্থী ফিরে এসেছে তাদের জন্য সরকার বাস্তব কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি এবং কাউকে স্ব স্ব বাস্তুভিটা বা জায়গায় পুনর্বাসন দিতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। যার ফলে অন্যান্য শরণার্থী, যারা ত্রিপুরার বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে রয়েছে, তারা ফিরে আসার আশা হারিয়ে ফেলেছে। তাই কোন প্রকার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা ছাড়া ত্রিপুরায় অবস্থানরত ৫০ হাজার শরণার্থীকে ফিরে আসার অনুরোধ জানানো

আদৌ সমীচীন হবে কি না তাও একবার ভালভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। এখানে আরও একটা বিষয় উল্লেখ করতে হয় যে, পার্বত চট্টগ্রামে নানা স্থানে বসবাসরত উপজাতি জনগণকে তাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করে শান্তিবাহিনীর ভয়ের অজুহাতে শান্তি গ্রাম, আদর্শ গ্রাম, বড় গ্রাম, যৌথ খামার নামধারী বিভিন্ন গুচ্ছগ্রামে বন্দী অবস্থায় দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। ত্রিপুরার শরণার্থী শিবির হতে যারা কোন রকমে পালিয়ে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকেও কোন না কোন গুচ্ছগ্রামে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। এই সব গুচ্ছগ্রামগুলি মূলত এক-একটা অঘোষিত বন্দী শিবির। নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে এমনকি বিশেষ কোন জরুরী ব্যাপারেও স্থানীয় ক্যাম্প কমাণ্ডারের অনুমতি ছাড়া যাওয়া-আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অনেক গুচ্ছ গ্রামে সন্ধ্যার আগে দা, কুঠার, কোদাল ইত্যাদি কাজ করার হাতিয়ার স্থানীয় ক্যাম্পে জমা দিয়ে আসতে হয় এবং পরদিন সকালে কাজে যাওয়ার সময় আবার এগুলি সংগ্রহ করে আনতে হয়। এইসব গুচ্ছগ্রাম ভেঙে দেয়াসহ এই প্রথা বাতিলের জন্য আমি সংসদে বহুবার বলছি। কিন্তু কোন ফল হয়নি। এইসব গুচ্ছগ্রাম ভেঙে দেয়াসহ এই প্রথা বাতিলের জন্য ইতিপূর্বেও বহুবার এখানকার জনগণ মিছিল সমাবেশ করে প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং স্থানীয় প্রশাসনের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেছে। সর্বশেষ বিক্ষোভ মিছিল করা হয় ৩ মার্চ '৯৩ তারিখে খাগড়াছড়িতে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপিও পেশ করা হয়। এখানে অন্য আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম তিন জেলার স্থানীয় সরকার এমেণ্ডমেণ্ট বিল যখন এবার সপ্তম জাতীয় সংসদ অধিবেশনে উত্থাপন করা হয়, তখন আমার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের ভারপ্রাপ্ত, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এস এম মুস্তাফিজুর রহমান এবং ভারপ্রাপ্ত সংসদ উপনেতা কৃষিমন্ত্রী মাজিদ-উল হকের আলাপ হয়। তারা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পরবর্তী স্থানীয় সরকার পরিষদ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে বর্তমানে বহাল স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি বাতিল করে একজন তত্ত্বাবধায়ক বা উপদেষ্টা নিয়োগের মাধ্যমে এই মধ্যবর্তী সময়টাতে ঐ পরিষদগুলি কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া ব্যবস্থা করবেন। এ ব্যাপারে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি ও যথাযথ আকর্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এব্যাপারে কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বর্তমান স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণভাবে জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। তাছাড়াও এই স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোকে জন্মলগ্ন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ কোনভাবে মেনে নিতে বা গ্রহণ করতে পারেনি। নানা কারণে এই স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি গঠনতন্ত্রসহ কতিপয় সাংবিধানিক ধারারও আমূল পরিবর্তন বা সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সর্বশেষ সংলাপের সময় বাবু সন্তু লারমা কর্তৃক তাদের দাবী-দাওয়া সম্বলিত একটি রূপরেখা কমিটির নেতা যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) আলি আহমদের কাছে পেশ করা হয়। তার বদিও উপস্থিত অন্যান্য সংসদ সদস্যকে দেয়া হয়। বৈঠক চলাকালীন সময়ে যদিও এ ব্যাপারে সঠিক কোন আলাপ আলোচনা হয়নি, তবুও কথা ছিল যে ঢাকায় ফিরে আসার পর কমিটির সদস্যবৃন্দের মধ্যে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ হবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, এ যাবত এ ব্যাপারে কোন আলাপই হয়নি। এতে আমাদের মনে হয়, দীর্ঘদিন ধরে ঝুলিয়ে রাখা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান করার ব্যাপারে বর্তমান সরকারের কোন সদিচ্ছা নেই। এসব শুধু কালক্ষেপণ আর বহির্বিশ্বে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা যে বাংলাদেশ সরকার অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ নিচ্ছে। এভাবে বিশ্ব-বিবেককে আরো একবার ভিন্ন খাতে চালিত করার ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। আর যদি সরকার 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' নীতি অবলম্বন করে থাকে তাহলে আমাদের বলার কিছুই নেই বরং সাধুবাদই দেবো। আমরা চাই বাস্তবে এটি সরকারী সম্মতি লাভ করুক যাতে করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে সমস্যা সমাধানের শান্তি প্রক্রিয়ার কাজ আরও ত্বরান্বিত ও ফলপ্রসূ হয়। সদিচ্ছার বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ বর্তমানে বহাল স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহ বাতিলসহ বিভিন্ন অঘোষিত কারাগার গুচ্ছগ্রাম ভেঙে দিয়ে এবং ঐসব প্রথা বাতিল করে উপজাতীয় লোকদের তাদের স্ব স্ব ভিটামাটিতে ফিরে যেতে দেয়া হোক। উল্লেখ্য, সর্বশেষ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে সংলাপের সময় তারাও এই গুচ্ছগ্রামসমূহ বাতিলের দাবী উত্থাপন করেছিলো। আমাদের কথা হলো, ভারত থেকে ফিরে আসা শরণার্থীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনসহ

এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত ৫০ হাজার উপজাতীয় শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশ এবং বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। নতুবা এ সমস্ত মূল সমস্যা জিইয়ে রাখলে সরকারের এই কালক্ষেপণের ফলে অদূর ভবিষ্যতে জাতির ভাগ্যাকাশে এক বিরাট বিপর্যয় নেমে আসার আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সরকার যদি সব সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রতিনিয়ত সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বপর্যায়ে দলীয় প্রভাব বিস্তার করতে ব্যস্ত থাকে তাহলে সেটা হবে জাতীর জন্য খুবই দুঃখজনক এবং ইচ্ছা-কৃতভাবে জাতিকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়ার সামিল। কাজেই সরকারের উচিত কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার আশু সমাধান দেয়া।

কল্পরঞ্জন চাকমা ঃ রাজনীতিক। জাতীয় সংসদ সদস্য—২৫৮, খাগড়াছড়ি।

সংবাদ

পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন— এ্যামনেষ্টি

গত এপ্রিলে প্রকাশিত এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের বার্ষিক রিপোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘনের উপর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এ রিপোর্টে বলা হয়, ৯০ এ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এরশাদের পতনের পর বাংলাদেশে কিছুটা রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও সারা দেশে মানবাধিকারের অবনতি ঘটেছে। রিপোর্টে বলা হয় যে, সেখানে বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় হাজার হাজার ভিন্ন মতাবলম্বীকে আটক করা হয়েছে। বিভিন্ন সমাবেশে ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক, সাংবাদিক ও জনতার উপর পুলিশী নির্যাতন ও বিভিন্ন ঘটনায় পুলিশ, বিডিআর ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা গুলি করে অনেককে হত্যা করেছে। রিপোর্টে এসব আটক, নির্যাতন ও হত্যার বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরা হয়।

এ্যামনেষ্টির রিপোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের উপরও বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ সরকার শান্তি বাহিনী দমনের নামে এসব মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে। সেখানে বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় পাহাড়ী গণপরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীমনতোষ দেওয়ানসহ পাহাড়ী পরিষদের ৬ জন সদস্যকে বিনাপরাধে আটক, সামরিক অভিযানের সময় জুম্ম জনগণের ওপর অমানবিক নির্যাতন এবং অবিরন চাকমাকে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়েছে। রিপোর্টে এসব ঘটনার বিবরণসহ লোগাং গণহত্যা '৯২ এর প্রহসনমূলক তদন্ত কমিটি গঠন, রিপোর্ট প্রদান প্রভৃতি বিষয় উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশন্যাল অবশ্য মানবাধিকার লংঘনের এসব ঘটনাসমূহ বিগত সময়ে তিনটি রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেছিল। উল্লেখ্য যে, গত এপ্রিলে প্যারিসে অনুষ্ঠিত কনসোর্টিয়াম বৈঠকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লংঘনের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অভিযুক্ত করেছিল। এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের এই রিপোর্টে সেই সব মানবাধিকার লংঘনের সত্যতা আরো প্রমাণিত হলো।

ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতকরণ

দিঘীনালা রিজিয়ন কম্যানডার কর্ণেল মাহবুব হাসান চাপ প্রয়োগ করে আর্থিক প্রলোভনে ৮ জন জুম্মকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছেন। অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে এই ধর্মান্তর করা হলেও ইদানিং তা ফাঁস হয়ে যায় ও জুম্ম জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ধর্মান্তরিতরা হচ্ছে...

(১) বলি রঞ্জন চাকমা (২৭), পীং সুরেন্দ্র লাল চাকমা, গ্রাম—বানছড়া, দিঘীনালা, ইসলামী নাম—মোঃ সাজেদ আলী শেখ;

(২) স্বর্ণা চাকমা (২৪), স্বামী—বলি রঞ্জন চাকমা, ঠিকানা—ঐ, ইসলামী নাম—ফাতেমা খাতুন;

(৩) রসিক গুরি চাকমা, পীং—বলি রঞ্জন চাকমা, ঠিকানা—ঐ, ইসলামী নাম—মোসাম্মত রওশন আরা বেগম;

(৪) মিলাবো চাকমা, পীং—ঐ, ঠিকানা—ঐ, ইসলামী নাম—মোসাম্মত তসলিমা খাতুন ;

(৫) দিঘী কুমার চাকমা, পীং—ঐ, ঠিকানা—ঐ, ইসলামী নাম—মোঃ আব্দুল্লাহ ;

(৬) সুখী কুমার চাকমা, পীং—ঐ, ঠিকানা—ঐ, ইসলামী নাম—মোসাম্মত সখিনা খাতুন ;

(৭) শংকর চাকমা, (২৫) পীং—অমর কান্তি চাকমা, গ্রাম—বড়াদম, দিঘীনালা, ইসলামী নাম—আব্দুল শহীদ মোঃ সাইফুল ইসলাম ;

১ নং—৬নং ব্যাক্তিদের ২৫শে নভেম্বর '৯২ শপথ নামার ক্রমিক নং ১৪০/৯২) ও ৭ নং ব্যাক্তিকে ৩০শে নভেম্বর'৯২ শপথনামা—১৪৮/৯২ ইং ধর্মান্তরিত করা হয়। তাদের ইসলামে দীক্ষা দেন মৌলবী হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল বাশার ও দিঘীনালা থানা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাহ্মুদ রানা শপথনামা প্রদান করেন।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলন

গত ২২শে মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি, এস, সি, সড়ক দ্বীপে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। তিনি কবুতর ও বেলুন উড়িয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, জাতীয় পতাকা উত্তোলনসহ পাশা-পাশি পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের দলীয় পতাকা উত্তোলন ও সংগীত পরিবেশন করা হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম বলেন—জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ দেশের প্রতিটি মানুষের অধিকার রয়েছে। তিনি বলেন, পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি কিছুটা ভিন্নতর হলেও তারা এদেশেরই নাগরিক। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে তাদের উপর যে অন্যায় অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হচ্ছে তা কোন সুস্থ্য বিবেকবান মানুষই মেনে দিতে পারেন না।

এদিন বিকেলে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত "বর্তমান সরকারের করণীয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম শীর্ষক আলোচনায় বক্তাগণ বলেন, একাত্তরে বাঙ্গালী মুসলমানদের উপর পাকিস্তানীরা যা করেছিল এখন আমরা বাংলাদেশীরা পার্বত্য বাসীদের উপর তাই করছি। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, নব্বই এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখন দেশে গণতন্ত্রের ভড়ং চলছে। বক্তাগণ বলেন, বাঙালী সামরিক শাসন হটিয়েছে, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো অলিখিত সামরিক শাসন চলছে। নির্যাতন চালানো হচ্ছে। বক্তাগণ আরো বলেন, পাহাড়ের চূড়ায় কোন সেনানিবাস দরকার নেই। সেনাবাহিনী এখন শাসনক্ষমতায় নেই, কিন্তু কোনো অদৃশ্য সেনাশাসন থাকা চলবেনা।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রসিত বিকাশ খীসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন বদরুদ্দীন উমর, হায়দর আকবর খান রণো, হাসানুল হক ইনু, আব্দুল্লাহ সরকার, ওবায়দুল কাদের প্রমুখ।

(দৈনিক পূর্বকোণ ও ভোরের কাগজ থেকে সংকলিত)

জনসংহতি সমিতি ও সরকারের বৈঠক

খাগড়াছড়ি। গত ২২শে মে জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকারের ৯ম বৈঠক (বর্তমান সরকারের সাথে ৩য়) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন যথারীতি জনসংহতি সমিতি সদস্য-বৃন্দকে থুম্‌কছড়া (লোগাং) থেকে হেলিকপ্টারযোগে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে আনা হয়। বৈঠকের শুরুতে সরকারী দলের প্রধান যোগাযোগমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদ বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রধানত তাঁর ভারত সফরের সময় জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে

আলোচনায় তুলে ধরেন। জনসংহতি সমিতির দলীয় প্রধান শ্রীসন্তু লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সরকারের অনিচ্ছা ও উভয় পক্ষের ঘোষিত যুদ্ধবিরতি লংঘনের অভিযোগ করেন। তিনি বলেন—৮ম বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার পক্ষ জনসংহতি সমিতির সাথে যথাসময়ে বৈঠকে বসতে ও প্রশাসনিক আলোচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে জুম্ম বন্দীদের মুক্তি প্রদান, গুচ্ছগ্রাম ভেঙ্গে দেয়া, বহিরাগতদের বসতি সম্প্রসারণ বন্ধকরণ ও বেসামরিকীকরণ—সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

প্রত্যুত্তরে সরকার পক্ষের প্রধান জনাব আলি আহম্মদ উপরোক্ত অভিযোগসমূহ অস্বীকার করে বলেন যে সরকারের সদিচ্ছা রয়েছে, এ যাবৎ অনেক জুম্ম বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন সভায় সামরিক অফিসারেরা সভাপতিত্ব করেন না, গুচ্ছগ্রাম ভেঙ্গে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং কোন অনুপ্রবেশ ঘটছে না আর কোন বহিরাগতকে বসতি ও জমিজমা দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু কখন গুচ্ছগ্রাম ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে এ প্রশ্নের জবাবে কোন সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হন। তিনি আরো বলেন যে সরকার পক্ষে কোন যুদ্ধবিরতি লংঘিত হচ্ছে না বরঞ্চ জনসংহতি সমিতিই যুদ্ধবিরতি লংঘন করেছে। সরকার পক্ষের প্রধানের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষত যুদ্ধবিরতি লংঘনের বিষয় নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি প্রদান করা হয়। ফলতঃ এক পর্যায়ে বৈঠকের পরিবেশ বেশ উত্তেজনাকর হয়ে উঠে। জনসংহতি সমিতির প্রদত্ত ৫ দফা দাবীর উপরে সরকারের মতামত জানতে চাওয়া হলে জনাব আলি আহম্মদ বলেন—পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা রয়েছে এবং তা পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বহিষ্কারকরণ, স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠনকরণ, ইনার লাইন রেগুলেশন প্রদানকরণ, দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানকরণ সম্ভব নয় বলে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে জানান। দু'নম্বর দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি বলেন যে—পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়িকে ইতিমধ্যেই একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিটে পরিণত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অন্তর্ভুক্ত স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় স্থাপন করা হয়েছে। বহিরাগতদের দ্বারা বেদখলকৃত জমি ফেরৎ প্রদান এবং বহিরাগতদের নিকট লীজ বা বন্দোবস্তীকৃত সমস্ত জমি আঞ্চলিক পরিষদের নিকট হস্তান্তরের বিষয়সহ ভূমি অধিকার সংক্রান্ত দাবীর বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট উত্তর দিতে তিনি ব্যর্থ হন। তাছাড়া স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থা প্রদানের বিষয়েও সরকার পক্ষ যথাযথভাবে অবহিত নন বলে অভিমত জ্ঞাপন করেন।

তিন নম্বর দাবীর প্রেক্ষিতে সরকার পক্ষে জনাব আলি আহম্মদ বলেন—১৯৪৭ সাল থেকে যারা বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করে বসতি স্থাপন ও জমি বেদখল করেছে তাদেরকে সরিয়ে নেয়া সম্ভবপর নয় এবং ১৯৬০ সালের পরে যে সমস্ত জুম্ম নরনারী ভারতে আশ্রিত হয়ে আছে তাদেরকে সম্মানজনক পুনর্বাসন প্রদানও সম্ভবপর নয়। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে তুলে নেয়ার দাবীতে তিনি বলেন যে—পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সেনানিবাস ছাড়া আর কোন ক্যাম্প থাকবে না।

চার নম্বর দাবীর ক্ষেত্রে তিনি বলেন যে—জনসংহতি সমিতির সদস্যদেরকে যথাযথভাবে পুনর্বাসন আলোচনা করে সমাধান করা যাবে। সিভিল ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জুম্ম জনগণকে আলাদা কোটা দেয়া সম্ভব নয় বলে তিনি জানান। পার্বত্য চট্টগ্রামে একটা পূর্ণাঙ্গ বেতার কেন্দ্র ইতিমধ্যেই দেয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে তিনি জানান।

অবশেষে ৩১শে আগষ্ট, ১৯৯৩ পর্যন্ত উভয় পক্ষে আরও তিন মাস যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ১৫ই জুলাই, ১৯৯৩-এর মধ্যে পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত করা ও পরবর্তী বৈঠকে ৫ দফা দাবীর উপরে বিশদভাবে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ভারতে আশ্রিত জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতির তরফ থেকে যা সম্ভব সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়। বৈঠক বিকাল ৪-১৫ মিনিট পর্যন্ত চলে। এরপরে উভয় পক্ষের নেতৃদ্বয় কয়েক মিনিটের এক সংক্ষিপ্ত সাংবাদিক সাক্ষাতকার প্রদান করেন।

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন

জনসংহতি সমিতির সাথে অনুষ্ঠিত ৯ম বৈঠকে আগামী ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির সরকারী সিদ্ধান্তের পরও বাংলাদেশ সেনা সদস্যরা যুদ্ধবিরতি লংঘন করেছে। দিঘীনালা থানাধীন বাঘাইছড়ি এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের থলিপাড়া ও সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে চারটা নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন ও শান্তিবাহিনীর তল্লাসী অভিযানের সময় বাংলাদেশ সেনা সদস্যরা পর পর ৩রা ও ৪ঠা জুন শান্তি-বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বাবুছড়া জোন কম্যাণ্ডার লেঃ কর্ণেল সঈদ ও দিঘীনালার সেনানিবাসের ব্রিগেড কম্যাণ্ডার কর্ণেল এ, কে, মাহবুবুব হাসান এর যৌথ নেতৃত্বে এ অভিযান ও আক্রমণ পরিচালিত হয়। এই সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সেনা সদস্যরা জুম্মদের কয়েকটি বাড়ী ভেঙ্গে দেয়, অনেকের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালায় এবং জিনিষপত্র ও অনেকের মোরগ-মুরগী বিনামূল্যে নিয়ে যায়। এই অত্যাচার-নির্যাতন ও লুঠপাটে ক্যাপ্টেন রেজাউল এবং মেজর নজরুল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

দু'জন জুম্মের গুপ্তহত্যা

গত ৩১শে মে দু'জন জুম্মের গুপ্তহত্যার এক চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গেছে। ঐদিন রামগড় যৌথ খামারের নিবাসী শ্রীকামিনী ত্রিপুরা (৪২) পিতা মৃত লখিয়া ত্রিপুরা ও তখিরাম ত্রিপুরা (৪৫) পিতা মৃত শিকারাম ত্রিপুরা যৌথ খামারের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে গেলে এই গুপ্তহত্যার শিকার হয়। ঘটনার দিনে উক্ত দু'জন জুম্ম বাড়ীতে ফিরে না আসলে গ্রামবাসীরা তা স্থানীয় থানায় অবহিত করে। পরদিন গ্রামবাসীরা রামগড় জালিয়াপাড়া রাস্তার ২নং সেন্টি পোষ্টের কাছে একটি লাশ দেখতে পায়। নিহতদের আত্মীয়রা ঐ লাশটি সনাক্ত করতে গেলে স্থানীয় সেনা ক্যাম্প তাদেরকে সনাক্ত করতে বাধা প্রদান করে এবং ময়না কম্যাণ্ডার তদন্ত ছাড়া রাত্রের অন্ধকারে উক্ত লাশটি সরিয়ে ফেলে। ঘটনার দু'দিন পর ফেণী নদীতে মস্তকহীন আরও একটি লাশ ভাসতে দেখা যায়। গ্রামবাসীরা স্থানীয় থানায় তা অবহিত করলে থানা কর্তৃপক্ষ নিষ্ক্রিয় থাকে। গ্রামবাসীদের ধারণা স্থানীয় সেনা ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা ঐ দু'জন জুম্মকে গুপ্তভাবে হত্যা করেছে এবং থানা কর্তৃপক্ষ নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য হয়েছে।

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারনা :—তথ্য ও প্রচার বিভাগ পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি।